শব্দ থেকে সময় : কেশবচন্দ্র সেন, 'গোরা' উপন্যাস

বিভাবসু দত্ত

একটি উপন্যাসের রচনাকাল আর তার অন্তর্সময়ের মধ্যে যদি রচিত হয়ে যায় একটি ব্যবধান তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। নেই এই কারণেই যে, উপন্যাসের নির্মাণশিল্পের এটি একটি মান্য রীতি। রচনার সময় থেকে এই যে সরে যাওয়া তা অবশ্যই একজন রচয়িতার প্রাতিস্বিক ভাবনার অভিজ্ঞান। 'গোরা' উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটিই ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'গোরা' উপন্যাসটি এবং এই ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এই সময়খন্ডে উপন্যাসটি রচিত হলেও কাহিনিটি কিন্তু সেই সময়ের নয়, বছর ত্রিশ পেরিয়ে গেছেন ঔপন্যাসিক। 'গোরা' উপ্যন্যাসের আন্তর্সময় নিশ্চিতভাবে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ। কেশবচন্দ্র সেন তখনো ঘোষণা করেননি 'নববিধান', কেশবচন্দ্র 'নববিধান ঘোষণা করেন ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ জানুয়ারি। উপন্যাসটির অন্তঃসাক্ষ্য থেকে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় কাহিনিটি অবশ্যই 'নববিধান' প্রতিষ্ঠার পূর্বের।

রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসটির প্রেক্ষাপটে আছে উনিশ শতকের শেষার্ধের ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের'র কার্যাবলি, হিন্দুসমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, ব্রাহ্ম-হিন্দুর বিবাহ নিয়ে সমাজে অশান্তি আর সমাজের নিজেদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ। একটি ক্রান্তিকালের কাহিনি এটি, রবীন্দ্রনাথ কাহিনিটির ভিতর সুনিপুণভাবে বুনে দিয়েছেন একটি ঝোড়ো সময়কে। তাঁর অন্বিষ্ট ছিল একটি সময়খণ্ডের অন্তঃস্পন্দনটিকে ধরা - সে কাজটি তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছেন এই উপন্যাসে।

এই সময়কালের ভরকেন্দ্রে আছেন ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার কেশবচন্দ্র সেন। তাই অনিবার্যতই কেশবচন্দ্র সেনের প্রসঙ্গ এসেছে এই উপন্যাসে। বরং বলা ভালো সারা উপন্যাস জুড়েই আছে কেশবচন্দ্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি। গোরা যখন এটোয়াতে জন্মগ্রহণ করছে, সেই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে, সে সময় কলকাতায় গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিচ্ছেন। গোরার পিতা কৃষ্ণদয়ালবাবু এরপর যখন কলকাতায় ফিরে আসেন গোরা তখন শিশু, ফলে আশৈশব গোরা নাম শুনে আসছে কেশবচন্দ্রের। ছাত্রাবস্থায় কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে গোরা এতই মুগ্ধ হয়েছিল যে সে কেশবচন্দ্রের ভক্ত হয়ে পড়ে। উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র পরেশবাবু এবং হারানবাবু ওরফে পানুবাবু ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' -এর সদস্য। এই উপন্যাসে রক্ষণশীলদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন হারানবাবু আর এর বিপ্রতীপে আছেন পরেশবাবু, যিনি উদারপন্থীদের প্রতিনিধি। এই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে রক্ষণশীল এবং উদারপন্থীদের যে অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব ছিল তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে এই 'গোরা' উপন্যাসে।

(২)

'গোরা' উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে যেহেতু কেশবচন্দ্র আছেন তাই আমরা তাঁর কর্মমুখর জীবনের বারান্দায় পরিক্রমা করব।

গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারের মানুষ কেশবচন্দ্র সেন (জন্ম ১৯নভেম্বর,১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপস্থিতিতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে গোপনে প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করে যোগ দিলেন ব্রাহ্মসমাজে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিমলা পাহাড় থেকে ফিরে এসে স্বাগত জানালেন কেশবচন্দ্র সেনকে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেনের যৌথ চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্মে আধ্যাত্মিকতা এবং সমাজসেবামূলক কাজের একটা জোয়ার এসেছিল। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে এঁরা দুজন স্থাপন করেছিলেন যে 'ব্রাহ্ম বিদ্যালয়' সে বিদ্যালয়ে প্রতি রবিবার সকালে অধিবেশন হত। এই অধিবেশনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় বক্তৃতা দিতেন আর ইংরাজিতে বক্তৃতা দিতেন কেশবচন্দ্র সেন। কখনো কখনো কেশবচন্দ্র টানা চার-পাঁচ ঘন্টা বক্তৃতা দিতেন। এই সময়েই কেশবচন্দ্র বাগ্মী হিসেবে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কর্মমুখর এবং বাগ্মী কেশবচন্দ্রকে দেবেন্দ্রনাথ সবিশেষ স্নেহ করতেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে কুলগুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ বিষয়ে পারিবারিক বিবাদের জেরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর গৃহে আশ্রয় নেন সস্ত্রীক কেশবচন্দ্র। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের যুগ্ম সচিবের পদে যোগ দেন। এ সময় কেশবচন্দ্র শিক্ষা ও সমাজসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। একেশ্বরবাদ, মানসিক এবং নৈতিক দর্শনের প্রয়োজনীয় নীতিসম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল কেশবচন্দ্র 'ব্রহ্ম বিদ্যালয়' শুরু করেন। এই ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দেই ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য 'ব্রাহ্ম নর্মাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে 'দ্য ট্রাক্টস ফর দি টাইমস' মাসিক পত্রিকাটি কেশবচন্দ্র প্রকাশ করেন। এই ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠা হয় ব্রাহ্মসমাজের 'সঙ্গত-সভা'। 'রিট্রিট' (retreat) বা ধর্মচিন্তার জন্য একবার নিভৃত বাসের ব্যবস্থা হয়; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন সহ একদল ব্রাহ্ম সেখানে যোগ দেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেয়াই হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় নগরসংগীত। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে, এটিই প্রথম ব্রাহ্মনগরপরিক্রমা। এই রিট্রিটে সিদ্ধান্ত হয় ছোট ছোট অধিবেশন করে ব্রাহ্মরা পরস্পরের মধ্যে ব্রহ্ম ও অধ্যাত্মবিষয়ে আলাপ - আলোচনা করবেন। এই অনুসারে কলকাতায় যে দু'তিনটি 'সঙ্গতসভা' স্থাপিত হয়েছিল তার মধ্যে

কেশবচন্দ্র সেনের কলুটোলার বাড়িতে স্থাপিত 'সঙ্গত-সভা' অন্যতম, সেখানে নিয়মিত সাপ্তাহিক আধিবেশন অনুষ্ঠিত হত।

কেশবচন্দ্রেব ভাষণ এবং উপদেশ একদল শিক্ষিত তরুণকে আধ্যাত্মিক সাধনায় এত বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল যে তারা ব্রাহ্মসমাজের কাজে গতি নিয়ে আসেন এবং কেশবচন্দ্রের কর্মের সহযোগী হয়েছিলেন। কলুটোলা 'সঙ্গত-সভা'র সদস্যরা বাইবেল, থিয়োডোর পার্কার, অধ্যাপক হিউম্যান প্রভৃতির রচনা অধ্যয়ন করতেন; তাঁরা কতকগুলি আচরণবিধি তৈরি করে নিয়েছিলেন। খ্রিস্টান প্রভাবের ফলে অনুতাপের ভাবটি ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রসারিত হয়; ব্রাহ্মদের মধ্যে খ্রিস্টানধর্মের নীতির প্রবর্তন করেন কেশবচন্দ্র সেন।

সমাজসেবামূলক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন কেশবচন্দ্র সেন। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশগুলিতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে এই দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের মঙ্গলার্থে ও কেশবচন্দ্রে নেতৃত্বে এক বিশেষ ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা করা হয়; এই উপসনায় বহু মানুষ সমাগম হয়। উপাসনার শেষে অনেকে তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র অকাতরে দান করে দিয়েছিলেন আর্ত মানুষের সেবায়।

শুধু কলকাতার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি কেশবচন্দ্র। তিনি ১৮৬১-র মে মাসে কৃষ্ণনগরে যান; এখানে রেভারেন্ড ডাইসনকে এক ধর্মীয় বিতর্কে পরাজিত করেন এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের মহিমা প্রতিষ্ঠা করেন। জনসমক্ষে বক্তৃতা দিয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করেন কেশবচন্দ্র। এই ১৯৬১ খ্রিস্টাবেতর আগস্ট মাসে কেশবচন্দ্র সেন সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী ইংরেজি পাক্ষিক 'ইন্ডিয়ান মিরর' প্রকাশ করেন।

১৮৬২ খ্রিস্টাদের ১৩ এপ্রিল কেশবচন্দ্র সেনকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে বরণ করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' নামে অভিহিত করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে কেশবচন্দ্র স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন। স্ত্রীকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসার অপরাধে তাঁকে গৃহচ্যুত করা হলে তিনি সপরিবারে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে আশ্রয় নেন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ নিজস্ব পাঠক্রম অবলম্বনে প্রথম একটি বেসরকারি কলেজ স্থাপন করেন কেশবচন্দ্র; কলেজটির নাম, 'ক্যালকাটা কলেজ'। এই বছরই শিশুদের সাধারণ জ্ঞান এবং নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য 'কলুটোলা শিশু বিদ্যালয়' স্থাপন করলেন তিনি, প্রতি শনিবার বিকেলে এই বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন হতো।

১৮৬২-র আগস্ট মাসে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহে সহায়তা করেছিলেন কেশবচন্দ্র।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে নারীমুক্তির জন্য সবিশেষ চেষ্টা শুরু করেন কেশবচন্দ্র। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে সূচনা হল অন্তঃপুর উপাসনা। অন্তঃপুর শিক্ষার সূচনা হল এ বছরই। ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় শিক্ষিকাগণ মেয়েদের পড়াবার জন্য বাড়ি বাড়ি যেতেন। মেয়েদের জন্য এই ১৮৬৩ সালেই কেশবচন্দ্র 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র সূচনা করেন। এই ১৮৬৩-তে 'ব্রাহ্মবন্ধুসভা' ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে 'ভারতে সমাজ সংস্কার' বিষয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন সেখানে তিনি আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি সমাজের দুর্দশার চিত্রটি তুলে ধরেছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকাটি সবিস্তারে আলোচনা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি সারা ভারতবর্ষের মোক্ষলাভের দিশা দেবেন।

কেশবচন্দ্রের অনুগমীরা সে সময় উগ্রপ্রগতিপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে বিধবানারীর অসবর্ণ বিবাহ পৌত্তালিকতাবিহীন পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন করেন। এই ঘটনায় ব্রাহ্মসমাজভূক্ত পুরাতনপন্থী বয়স্ক মানুষেরা ক্ষুব্ধ হন। আবার এই সময়ই উপবীত ধারণ করে আচার্যের দায়িত্ব পালনের বিপক্ষে মত দেন প্রগতিপন্থী ব্রাহ্মরা। এরই জেরে আচার্য পদ থেকে অপসারিত করা হয় সকলের শ্রদ্ধেয় অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে, এতে রক্ষণশীল ব্রাহ্মদের বৈপ্লবিক ভাবনা ও আচরণকে দেবেন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি চাননি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অতিদ্রুত পরিবর্তন। অনিবার্যতই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রচিত হয়ে যায় তাঁর দূরত্ব। এই প্রেক্ষিতেই দেবেন্দ্রনাথ সুনির্দিষ্ট কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে কেশবচন্দ্রের মতো প্রগতিবাদী ব্রাহ্মদের সমাজের কাজ থেকে অব্যাহতি দিলেন। এই পদক্ষেপগুলি হল:

১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেকে ব্রাহ্মসমাজের একমাত্র ট্রাস্টি বলে ঘোষণা করেন।

২। দেবেন্দ্রনাথ পুরনো পরিচালকমণ্ডলী বাতিল করলেন এবং এর পরিবর্তে শুধুমাত্র প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মদের নিয়ে নতুন পরিচালকমণ্ডলী গঠন করলেন। কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের জায়গায় সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক হিসেবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে নিযুক্ত করলেন।

৩। নবীন দলের হাত থেকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র ভার তুলে নেন দেবেন্দ্রনাথ আর এরই ফলশ্রুতি 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা প্রকাশ করলেন কেশবচন্দ্রের দল।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অর্থাৎ রক্ষণশীল ব্রাহ্মদের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁর অনুগামী অর্থাৎ প্রগতিপন্থী যুবক ব্রাহ্মদের বিরোধ এতই তীব্র আকার ধারণ করে যে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারিতে দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ থেকে কেশবচন্দ্র সদলবলে বেরিয়ে আসেন। ১৮৬৫ সালে বাৎসরিক উৎসবের পরে প্রগতিশীল ব্রাহ্মরা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহে একটি সাধারণ সভা করতে চাইলেও সে ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তখন চিৎপুর রোডের অন্য এক গৃহে সভা করে কেশবচন্দ্রের পরামর্শ অনুসারে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ট্রাষ্ট্রিরা ট্রাস্ট

সম্পত্তির দখল ও পরিচালনা করবেন কিন্তু মিশন ফান্ড এবং মিশন সংক্রান্ত কাজকর্ম (অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম অনুশীলন এবং প্রচারের কাজকর্ম) এক পরিচালন সমিতিকে দায়িত্ব দেওয়া হোক যার সম্পাদক হিসেবে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নাম স্থির হয়।

১৮৬৫ সালের ২৩ জুলাই কেশবচন্দ্র 'Struggle for Religious Independence and Progress in Barhmo Samaj' নামে যে বক্তৃতা দেন সেখানে তিনি কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ আনেন এবং সমাজের কাজকর্ম পরিচালনার সাংবিধানিক নিয়ম প্রয়োগের দাবি তোলেন। এই দিনই কেশবচন্দ্র সেন, উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, যদুনাথ চক্রবর্তী, নিবারণ চন্দ্র মুখার্জী এবং প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পাঠানো হয়। দেবেন্দ্রনাথ তাঁদের সেই আবেদনটি নামঞ্জুর করেন।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ১১ নভেম্বর চিৎপুর রোডের 'ক্যালকাটা কলেজের গৃহে ব্রাহ্মদের সভায় কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি নতুন সমাজ গড়ে উঠল, তার নাম দেওয়া হল 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ,' ইংরাজিতে 'The Bramho Samaj of India' এই সভায় দুশো ভারতীয় ব্রাহ্ম এবং তিনজন ইউরোপীয় উপস্থিত ছিলেন। নতুন ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হওয়ার পর কলকাতা 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যা লিখেছেন সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিকোণগত পার্থক্যটি ফুটে উঠেছে: 'আমার পিতা নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী ছিলেন ধর্মীয় আদর্শের ব্যাপারে, কিন্তু কেশবের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনেক বেশি উদার। যদিও কেশব পুরোপুরি বিজাতীয় আদর্শে মগ্ন হয়ে যান নি, তবু তাঁর শিক্ষা এবং অভ্যাস অনুযায়ী তিনি পাশ্চাত্য ভাবধারা ও সভ্যতাকে আত্মসাৎ করেছিলেন। যথার্থই, কেশবের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে খ্রিষ্টানধর্মের প্রভাব এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বারা গঠিত হয়েছিল।'[১]

ব্রাহ্মসমাজ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর বেশিরভাগ ব্রাহ্মই প্রগতিশীল দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ হিন্দু একেশ্বরবাদে ফিরে গেল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আদি ব্রাহ্মসমাজের কাজকর্ম রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে এক কমিটির হাতে অর্পণ করেন। এই সময়ের বর্ণনাটি শিবনাথ শাস্ত্রীর কলমে ফুটে উঠেছে : ''After the schism, the Adi Brahmo Samaj quietly retreadted into its old position of Hindu monotheism. Its organ, the Patrika, Maintained a dignified silence of the main issue of the contest and seldom replied to the adverse criticisms of the secessionists, The attitude of Devendranath Tagore, during this preiod of party struggle, was calm, dignified and lofty, He never opened his lips, never replied to a single charge, never made a single retore, and never gave any personal explanation; but patiently bere all, apparently satisfied with the thought that he had done duty to the church entrusted to his charde by rammohun Roy.

So great was the old leader's disappointment at the secession of Keshab Chander Sen and his friends that following the old Hindu practic of retiring from duties of life after futty, he soon retired rrom active participation in the work of samaj, leaving its affairs in the hand of a committee, with his trusted and velued friend babu Rajnarain Bose a its President."[২]

প্রকৃত প্রস্তাবে কেশবচন্দ্রের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' -ই তখন প্রগতিপন্থী আসল সমাজ হয়ে দাঁড়াল। কেশবচন্দ্রের ধর্মীয় সভা ও উপদেশে বহু মানুষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন; কেশবচন্দ্রের সভাসমিতি সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেশবচন্দ্র অনুভব করেছিলেন সমস্ত ভারতবর্ষের এক ব্রহ্মের অধীনে আনতে পারলে অবশ্যই উন্মেষ ঘটবে ভারতের জাতীয়তাবাদের আর ঐ জন্যেই তিনি ভারতের সর্বত্র প্রচারের কাজে গিয়েছিলেন। ভারতের বাইরেও ব্রহ্মের ও ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করেছিলেন। এতে ভারতবর্ষের মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটেছিল নিশ্চিতভাবেই।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে মহিলাদের প্রথম সামাজিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে মেয়েরা অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। কেশবচন্দ্রের নতুন ব্রাহ্ম মন্দিরটি ১৮৬৯ সাল সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার পর ১৮৭০ সালে মন্দিরের সাপ্তাহিক প্রার্থনাসভার সূচনা হয়; এই প্রার্থনাসভায় স্ত্রী-পুরুষ অংশগ্রহণ করত। এই উপাসনা হতো বাংলাভাষায়।

১৯৬৮ সালের বাৎসরিক উৎসবের পর কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য প্রথমে শান্তিপুর, পরে বিহার এবং উত্তর প্রদেশে যান। কেশবচন্দ্র এই সময় যে বক্তৃতা দেন তার মধ্যে ভক্তিভাবের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই সময় কেশবচন্দ্র চৈতন্যের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন তাই বৈষ্ণবদের মতো খোল, করতাল এবং একতারা সহযোগে সংকীর্তনের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মোপাসনাকে নবরূপ দেন।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র ইংলন্ড থেকে ফিরে যে ধর্মপ্রচার শুরু করেছিলেন সেখানে বৈষ্ণবীয় নামভক্তির উপর সবিশেষ জোর দেওয়া হয়। কেশবচন্দ্র বৈষ্ণবধর্মের অনুসরণে আবেগাত্মক ভক্তিবাদ, সংকীর্তন প্রথা, চৈতন্যভক্তি এবং নামমাহাত্ম্যের সূচনা করেছিলেন। এই ধরণের ব্রাহ্মধর্মসাধনের ফলে সমাজ সংস্কারের কাজে বিঘ্ন হতে লাগল। প্রগতিশীল ও উদারপন্থী ব্রাহ্মদের কাছে এ বিষয়টি অত্যন্ত অপছন্দের ছিল। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' -এর মধ্যে প্রথম থেকেই দুটি পৃথক ভাবধারার ব্রাহ্ম ছিলেন। এক গোষ্ঠী পুরোপুরি কেশবপন্থী। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সেই গোষ্ঠীভুক্ত। দ্বিতীয় গোষ্ঠী কেশবচন্দ্রের প্রগতিবাদিতায় সন্তুষ্ট নন। তাঁরা আরও প্রগতির পক্ষপাতী। বিজয়কৃষ্ণ

গোস্বামীরা সেই গোষ্ঠীর। পরবর্তীকালে এঁরাই ব্যক্তিপূজার বিরোধিতা করেন।

কেশবচন্দ্রকে প্রচলিত কোন সূত্রেই বাঁধা যাবে না - এত বেশি ব্যাপ্তি এবং এত বেশি বর্ণময় বৈচিত্র্য আছে যা দেখে আমরা বিস্মিত হই। ১৮৭০ সালের মার্চ মাসে কেশবচন্দ্র ইংলন্ড সফরে যান, ফিরে আসেন সেপ্টেম্বর মাসে। ইংলন্ডের চোদ্দটি শহরে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেকালের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন কেশবচন্দ্র ফলে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর বক্তৃতা শুনতেন। ১৮৭০ সালের ১১ নভেম্বর কেশবচন্দ্র ভারতীয়দের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে 'ইন্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন' তৈরি করেন। নারীদের উন্নতি, মেহনতী জনগণের শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা, সস্তায় সাহিত্যগ্রন্থ, মদ্যপান বর্জন, পরোপকার - এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল এই প্রতিষ্ঠানটির কর্মসূচী। উনিশ শতকের নবজাগরণে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ নভেম্বর কেশবচন্দ্র 'সুলভ সমাচার' নামে সাধারণ মানুষের জন্য সস্তার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র 'ইন্ডাস্টিয়াল স্কুল' এবং 'ওয়াকিং মেনস্ ইনস্টিটিউশন' বা নাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই ১৮৭১ সালেই খোলা হল শিক্ষিকাদের জন্য ট্রেনিং স্কুল। প্রতিষ্ঠিত হোল স্ত্রী জাতির উন্নতির জন্য 'বামাহিতৈষিনী সভা', আর সেই সঙ্গেই ব্যবস্থা হল 'বামাবোধিনী' পত্রিকাটির পুনঃপ্রকাশের। সুতরাং ব্রাহ্মনারীদের উন্নতিকল্পে কেশবচন্দ্রের ভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি অনিঃশেষ ভালবাসা ছিল কেশবচন্দ্রের। অবহেলিত চাষী, মজুর, গৃহভৃত্য, খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য তিনি গভীর ভাবনাচিন্তা করেছেন। এজন্য 'সুলভ সমাচার' - এর পৃষ্ঠায় সরকারি নীতির নিন্দা করতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। কেশবচন্দ্র সেন বলেছিলেন ''আশ্রিত প্রজাদিগকে খাইতে দাও, বিদ্যা দান কর, রোগ বিপদ হইতে উদ্ধার কর এবং দুষ্ট লোকের অত্যাচার হইতে তাদের বাঁচাও। কেবল কত টাকা মুনাফা হইল তারই দিকে চাহিয়া থাকিও না, প্রজার দুঃখে দুঃখি সুখে সুখী হও। উহাদের ভালবাসিতে শিক্ষা কর।''[৩]

সেবামূলক কর্মে কেশবচন্দ্র নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার জন্য 'ভারত সংস্কার সভা-র একটি দাতব্য বিভাগ ছিল। উত্তর ভারতের দুর্ভিক্ষে, নিম্নবঙ্গের ম্যালেরিয়ায়, মাদ্রাজের বন্যায় রিলিফের ব্যবস্থা করেন কেশবচন্দ্র। এমন কী পারস্যের দুর্ভিক্ষের জন্য তিনি ত্রাণ পাঠিয়েছিলেন।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম তৈরি হল খ্রিস্টীয় মঠের আদর্শে 'ভারত আশ্রম' নামে একটি আবাস। এখানে ব্রাহ্মভক্তগণ পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন এবং রান্না-খাওয়া হতো একসঙ্গে। স্ত্রীলোকদের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি চালু ছিল। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর ছাত্রদের জন্য তৈরী হয় 'ব্রাহ্মনিকেতন' আবাসগৃহ।

১৮৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর অনেক ব্রাহ্মব্যক্তির অনুরোধে এক সভায় 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'র উপাসকমন্ডলী পুনর্গঠিত করা হল। ১৮৭৪ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে তিনি উত্তর ও মধ্য ভারতে ধর্মীয় সফরে গিয়ে একমাস পরে ফিরে আসেন। ফিরে এসে কেশবচন্দ্র লক্ষ করলেন যে তাঁদের উপাসকদের মধ্যে বিরোধের মনোভাব হ্রাস পায় নি, তাই তিনি কঠোর তপস্যা ও কঠোর শৃঙ্খলা পালন করার পরামর্শ দিলেন।

প্রাচীন তপোবনের আদর্শের সঙ্গে আধুনিকতার মিশ্রণ ঘটিয়ে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরের কাছে মোড়পুকুর 'সাধন কানন' আশ্রম তৈরি করেন। এখানে ব্রহ্মধ্যান করা হত; স্বহস্তে রান্না, সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা, জলতোলা, বাঁশ কাটা, গাছ পোঁতা, রাস্তা - ঘাট নির্মাণ ইত্যাদি কাজগুলি এখানে করা হোত।

কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে ও উৎসাহে কলকাতায় 'এলবার্ট ইনস্টিটিউট' হলের দ্বারোদঘাটন হল ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে।

কেশবচন্দ্র অত্যন্ত সমাজসচেতন মানুষ। সমকালীন সমাজ তাকে প্রভাবিত করত। ইংরেজ সরকার আই.সি.এস. পরীক্ষায় বসার বয়স কমিয়ে দেওয়ায় ভারতীয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, এর প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে শুরু করলেন সিভিল সার্ভিস আন্দোলন। এই আন্দোলনের জন গঠিত কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বয়স কমানোর প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'- এর পক্ষ থেকে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে যে সভা করেন তাতে সভাপতিত্ব করেন কেশবচন্দ্র সেন। এটিই প্রথম রাজনৈতিক সভা তাঁর।

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি বৃটিশ সরকার কেশবচন্দ্রের কাছে তাঁর কন্যা সুনীতিদেবীর সঙ্গে কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজকুমার ও ভবিষ্যৎ রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব পাঠান। কেশবচন্দ্র প্রথমে রাজি না হলেও ইংরেজ সরকারের বারংবার চেষ্টায় এবং তাঁর অন্তরাত্মার সম্মতিতে এই বিবাহ সংঘটিত হয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৬মার্চ কেশবচন্দ্রের কন্যার সঙ্গে কুচবিহারের রাজ কুমারের বাগদান অনুষ্ঠিত হয়। এই বিবাহকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে অশান্তির কালো মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। এক দল ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রের বিরোধী হয়ে ওঠেন। কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে এঁদের অভিযোগ তিনি ব্রাহ্মসমাজ নীতিবিরোধী কাজ করেছেন। তাঁরা কেশবচন্দ্রের আদর্শ এবং কর্মের মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন না। — চূড়ান্ত অসঙ্গতি লক্ষ করে তাঁরা কেশববিরোধী হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁরা 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' থেকে বেরিয়ে এসে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'

প্রতিষ্ঠা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর বাচনে উঠে এসেছে এই কথাগুলি: ''১৮৭৭ সালের প্রারম্ভে সমাজের কার্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী উদ্দেশ্যে 'সমদর্শী' দল একটি ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা গঠনের জন্য ব্যগ্র হন। কেশবচন্দ্র তাঁহাদের চেষ্টাতে বাধা দেন নাই; বরং সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতে কুচবিহারের বিবাহ আসিয়া পড়িল; এবং ঐ বিবাহে ব্রাহ্মদের অবলম্বিত কতকগুলি নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে ব্রাহ্মদল ভাঙিয়া দুই ভাগ হইয়া যায়।

বিবাহান্তে কেশববাবুকে আচার্য্যের পদ হইতে ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ হইতে অবসৃত করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইল। কেশববাবু তাহা হইতে দিলেন না; সুতরাং ব্রাহ্মদের অধিকাংশ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ''সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'' নামে একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন।''[৪]

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিভাজনের পর কেশবচন্দ্র নতুন উদ্যোগে সাংগঠনিক কাজ শুরু করেন। বিহারের নানা জায়গায় তিনি ধর্মপ্রচার করে বেড়ান ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' -এর নারীদের নিয়ে গঠন করা হল 'আর্যনারী সমাজ'। এই ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন 'মেট্রোপলিটন ফিমেল স্কুল।'

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ২৪ জানুয়ারি টাউনহলে কেশবচন্দ্র ''উনবিংশ শতকে ঈশ্বর দর্শন'' বিষয়ে ভাষন দেন। ব্রাহ্মসমাজের এই ঝোড়ো সময়ে কেশবচন্দ্রও রূপান্তর ঘটালেন ব্রাহ্মসমাজের। তিনি প্রবর্তন করলেন নতুন ধর্মভাবনার। সমস্ত ধর্ম সমন্বয় করেন কেশবচন্দ্র সেন ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ জানুয়ারি ঘোষণা করলেন 'নববিধান' ধর্মমত। প্রকাশিত হল বাংলা সাপ্তাহিক 'নববিধান' এবং ইংরাজি সাপ্তাহিক 'সানডে মিরর' এই সময় থেকে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' রূপান্তরিত হল 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' -এ। ''পৃথিবীর সমস্ত বিধান যার মধ্যে নিহিত আছে তাই নববিধান। নববিধানের মূল ভাব সমন্বয়ের ভাব, এই সমন্বয় শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও প্রসারিত। নববিধানে পৃথিবীর সমুদয়ধর্ম - হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীস্টান, ইহুদী, শিখ ধর্মের সামঞ্জস্য ঘটেছে। সকল ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ ও মহাপুরুষদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। চিন্তার জগতেও সামঞ্জস্য এনেছে নববিধান। জ্ঞান ও ভক্তি, যোগ ও কর্ম, বিশ্বাস ও বিজ্ঞান, যুক্তি ও ভক্তি, প্রথা ও প্রগতি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ইত্যাদি বিপরীতমুখী ভাবগুলি 'নববিধান ধর্ম' মতে সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছে।''[৫]

'নববিধান' প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন জানিয়েছেন ঃ ''আমরা বিশ্বজনীন ধর্মমতে বিশ্বাস করি যা সমস্ত প্রাচীন জ্ঞানের আধার এবং আধুনিক বিজ্ঞানের পাত্র। এই ধর্ম সমস্ত সাধুসন্ত পয়গম্বরের মধ্যে সম্প্রীতি দেখে, সর্ব ধর্মগ্রন্থে দেয় ঐক্য এবং যাবতীয় বিধানের এক নিরবিচ্ছিন্নতা যা সমস্ত পার্থক্য ও বিভেদ ত্যাগ করে এবং এই বিশ্বজনীন ধর্ম সর্বদা ঐক্য ও শান্তিকেই বড় করে দেখে; যুক্তি ও বিশ্বাস, যোগ ও ভক্তি, কঠোর তপশ্চর্যা ও সর্বোচ্চ মাত্রার সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলে এবং তা সমস্ত রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়কে একদিন অভিন্ন এক রাজ্য ও এক পরিবারের রূপান্তরিত করবে।''[৬]

ধর্মের আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি স্থির করবার জন্য ১৮৮১ সালের ২৮ জানুয়ারি কেশবচন্দ্র 'শ্রীদরবার' বা 'প্রচারকদের দরবার' করেন। সেখানে তিনি ধর্মপ্রচারকদের দুটি দলে ভাগ করে তাঁদের বিভিন্ন কাজের ভার দিলেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ২৪ মার্চ 'দি নিউ ডিসপেনসেশন' নামে একটি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন কেশবচন্দ্র সেন। যতদিন সুস্থ ছিলেন ততদিন তিনি এই পত্রিকার সমস্ত লেখাই লিখতেন। এ সময় কেশচন্দ্র বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন।

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্রের গৃহে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল রচিত 'নববৃন্দাবন' নাটকটি অভিনয় হয়। এই নাটকটিতে নববিধানের সর্বধর্মমতের আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। এই বছরই তিনবার নাটকটি অভিনয় হয়। নাটকটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে মোট সাতবার নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের আমন্ত্রণে রামকৃষ্ণদেব ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি এই নাটকটির অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন।

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে 'নববিধান' ধর্মের ভক্তির প্লাবন দেখা দিল। তিনি আরতি ও নৃত্য সংযোজন করলেন 'নব আরতি' এবং 'নব নৃত্য' নাম দিয়ে। ১৮৮২ খ্রিস্টাদে ব্রাহ্মমন্দিরে প্রথম নবনৃত্য হয়েছিল ভাদ্রোৎসবের প্রথম দিনে।

কেশবচন্দ্রের রাজনৈতিক সচেতনতা আমরা লক্ষ করি। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ৮ অক্টোবর সরকারি নীতির প্রতিবাদে কলকাতা টাউন হলে যে সভা হয়েছিল ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে কেশবচন্দ্র সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন।

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুলাই থেকে ১৮৮২-র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি রবিবার কেশবচন্দ্র জীবন ও আচরণ বিষয়ে ভাষণ দিতেন। পরবর্তীকালে ১৮৮৩ খ্রিস্টাদে এই ভাষণমালা 'জীবনবেদ' নামে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র 'নবসংহিত' বা 'ভারতের আর্যদের জন্য নতুন জীবনবিধি' প্রচার করলেন এবং 'ব্রহ্ম সংগীত ও সংকীর্তন', 'ব্রাহ্ম গীতোপনিষদ', 'সাধু সমাগম', 'সেবকের নিবেদন', 'সমন্বয়', 'ভাষ্যমালা', 'যোগ ঃ বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক' - প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

কেশবচন্দ্র 'নবদেবালয়' নামে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন; ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ১ জানুয়ারি মন্দিরটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্রের হাটবার শক্তি না থাকায় চার-পাঁচ জন তাকে চেয়ারে বসিয়ে মন্দিরে

নিয়ে আসেন। অসুস্থ অবস্থায় ক্ষীণকণ্ঠে কেশবচন্দ্র প্রার্থনা ও উপাসনা করেছিলেন।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ৮ জানুয়ারি কেশবচন্দ্র সেন মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

(৩)

'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের' প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছে 'গোরা' উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের পরতে পরতে জড়িয়ে আছেন কেশবচন্দ্র সেন। তাই এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপটেই আলম্বই হলেন কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর ব্রাহ্মসমাজই নিয়ন্ত্রণ করেছে এই উপন্যাসের গতি। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক দিক থেকে তথ্য হিসেবেই কেশবচন্দ্রকে এনেছেন এই উপন্যাসে, কোনো মূল্যায়ন বা মন্তব্য সংযোজন করার চেষ্টা করেন নি তিনি। 'গোরা' উপন্যাসের বীজশব্দটি হল 'কেশববাবু'। এই উপন্যাসটির মধ্যে চারবার প্রত্যক্ষভাবে কেশবচন্দ্র সেন -এর কথা এসেছে। কেশবচন্দ্রের কথা এতো সরাসরি যে এর মধ্যে বাচনের কোনো দ্ব্যর্থকতা নেই। এ উপন্যাসে কেশবচন্দ্রকে নিয়ে আসা অবশ্য ঔপন্যাসিকের সচেতন নির্বাচন। উপন্যাসের প্রতিবেশ রচনা এবং চরিত্রগুলির ওপর কেশবচন্দ্রের প্রভাব চিহ্নিতকরণের জন্যই রবীন্দ্রনাথ সরাসরি 'কেশববাবু'কে এনেছেন। উপন্যাসে প্রথম দিকেই তিনি কেশবচন্দ্র সেনের কথা উল্লেখ করেছেন। 'গোরা' উপন্যাসের চারটি পরিচ্ছেদ কেশবচন্দ্র সেনের উল্লেখ আছে; এই পরিচ্ছেদ গুলি হল ঃ চার, পাঁচ, আট এবং নয়।

আমাদের আলোচনায় শুধুমাত্রই কেশবচন্দ্রের প্রসঙ্গটিকে মনে রেখেই পরিচ্ছদগুলির বিন্যাসক্রমে বদল ঘটনো হল। এগুলি এরকম:

প্রথম ।। গোরা : পরিচ্ছেদ : পাঁচ
দ্বিতীয় ।। বিনয় : পরিচ্ছেদ : পাঁচ
তৃতীয় ।। পরেশবাবু : পরিচ্ছেদ : আট

'গোরা' উপনাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে গোরার শৈশব কৈশোর এবং যৌবনের দিনযাপনের কথা সকৌতুকে বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'গোরা' উপনাসে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন একটু দেখা যাক, ঔপন্যাসিকের কথায় : ''গোরা' শিসুকাল হইতেই তাহার পাড়ায় এবং ইস্কুলের ছেলেদের সর্দারি করিত। মাস্টার-পন্ডিতের জীবন অসহ্য করিয়া তোলাই তাহার প্রধান কাজ এবং আমোদ ছিল। একটু বয়স হইতেই সে ছাত্রদের ক্লাবে 'স্বধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' এবং 'বিংশতি কোটি মানুষের বাস' আওড়াইয়া, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করিয়া ক্ষুদ্র বিদ্রোহীদের দলপতি হইয়া উঠিল। অবশেষে যখন এক সময় ছাত্রসভার ডিম্ব ভেদ করিয়া গোরা বয়স্কসভায় কাকলি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল তখন কৃষ্ণদয়ালবাবুর কাছে সেটা অত্যন্ত কৌতুকের বিষয় বলিয়া মনে হইল।" (পরিচ্ছেদ : ৫/ পৃ: ২০-২১)।

ছাত্রাবস্থায় গোরার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল 'ইংরেজ বিদ্বেষ'; 'গোরা রাস্তায় ঘাটে কোনো সুযোগে ইংরেজের সঙ্গে মারামারি করিতে পারিলে জীবন ধন্য মনে করিত।' (পরিচ্ছেদ : ৫/পৃ: ২১)।

আর এই সময়েই কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়েছে গোরা, এই মুগ্ধতাই তাকে ব্রাহ্মসমাজের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। ঔপন্যাসিকের কথায় : ''এদিকে কেশববাবুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া গোরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল; আবার এই সময়টাতেই কৃষ্ণদয়াল ঘোরতর আচারনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।" (পরিচ্ছেদ: ৫.পৃ: ২১)। গোরার সতেরো - আঠারো বছর বয়সকেই সম্ভবত ঔপন্যাসিক নির্দেশ করেছেন; সম্ভবত এই কারণেই যে, রবীন্দ্রনাথ নির্দিষ্টভাবে বয়সটি উল্লেখ করেননি। এই বয়সটিকে মেনে নিয়ে সালের হিসেবে সেটি দাঁড়ায় ১৮৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দ। এসময় বংলাদেশে খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছেন কেশবচন্দ্র। ব্রাহ্মধর্মে খোলা হাওয়া বইয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সংস্কারমুক্ত এক সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন কেশবচন্দ্র। যেখানে জাতপাতের কোনো চিহ্ন থাকবে না, শিক্ষার দিকেও তিনি জোর দিয়েছিলেন, সমাজসেবায় কেশবচন্দ্র নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, উনিশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্ত তরুণ সমাজ কেশবচন্দ্রের কার্যাবলীতে অবশ্যই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই সঙ্গেই তিনি তাঁর অসামান্য বাচনক্ষমতা। তিনি ইংরাজি, বাংলা এমন কী হিন্দিতে যে অসামান্য বক্তৃতা দিতেন সে বক্তৃতা সকলকেই স্পর্শ করত। তাঁর বক্তৃতার এমনই সম্মোহনী শক্তি ছিল যে তরুণ সমাজকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা কিংবদন্তী পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় 'ব্রাহ্মবিদ্যালয়'। এই বিদ্যালয়ের অধিবেশনে দেবেন্দ্রনাথও বাংলায় ও ও কেশবচন্দ্রই ইংরাজিতে বক্তৃতা দিতেন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৩ অক্টোবর শিক্ষার সংস্কার ও প্রসার, নারী শিক্ষা প্রভৃতির জন্য কেশবচন্দ্র জনসভা করেন এবং বক্তৃতা দেন। ১৮৬২ সালে কেশবচন্দ্র মানবপ্রেমের বাণীবাহী 'The Destiny of Human Life' নামে একটি স্মরণীয় বক্তৃতা দেন। দেশের মানুষকে সচেতন করার জন্য ধর্মসংস্কার, সমাজ সংস্কার এবং স্বদেশেপ্রেম বিষয়ে নিয়মিত ভাষণ দিয়েছেন কেশবচন্দ্র। প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মদের সঙ্গে মতবিরোধ ফলে কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে তাঁর দায়িত্ব বেড়ে গেছে অনেকটাই— তাঁকে বিভিন্ন স্থানের প্রচারের উদ্দেশ্যে যেতে হয়েছে; বক্তৃতা দিতে হয়েছে তাঁকে। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কলকাতায় এক সমাবেশে কেশবচন্দ্র 'Jesus Christ, Europe and Asia' শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে এই বক্তৃতাটি গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল; বিতর্কও সৃষ্টি হয়েছিল। এই বক্তৃতার সম্পূরক

হিসেবে ১৮৬৬-র ২৮ সেপ্টেম্বর 'Great Men' শীর্ষক একটি বক্তৃতা করে, এই, বক্তৃতায় তিনি শুধু খ্রিস্টের প্রতি নয় সমস্ত মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ড ভ্রমণে গিয়ে কেশবচন্দ্র সেন প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতেন। ইংলন্ডে সাতমাস থাকার সময় প্রায় চৌদ্দটি শহরে কেশবচন্দ্র গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি উপাসনা করেন এবং বক্তৃতা দেন। যেহেতু তিনি সেকালের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন তাই হাজার হাজার ইংরেজ তাঁর বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষের অনেক সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যা হল সাধারণ মানুষের মধ্যে মদ্যপান বৃদ্ধি - এই বিষয়ে কেশবচন্দ্র 'সেন্ট জেমস্ হল' -এ পাঁচ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে একটি ভাষণ দেন। বক্তৃতাটি ছিল 'ভারতের প্রতি ইংলন্ডের কর্তব্য'। এই সভায় সভাপতি ছিলেন লর্ড লরেন্স; তিনি কেশবচন্দ্রকে সমর্থন জানালেও লন্ডনের জনসাধারণ এই বক্তৃতায় একেবারেই সন্তুষ্ট হননি।[৭]

ইংল্যান্ড থেকে ফিরে কেশবচন্দ্র সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি শিক্ষার জন্য নানারকম কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর 'ইন্ডিয়ান রিফর্ম এ্যাসোসিয়েশন' গঠন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল' এবং 'ওয়াকিং মেনস্ ইনস্টিটিউশন' স্থাপন করেন। ১৮৭২ -এ বেহালায় জ্বরের মহামারিতে ত্রানের ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ১৮৭২ 'এ্যলবার্ট কলেজ৪ ১৮৭৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর 'ব্রাহ্ম নিকেতন' নামে একটি স্টুডেন্টস্ হোম খোলা হয়। কলকাতার টাউন হলে 'ভারতে প্রকাশ্য অশ্লীলতা দমনের জন্য সোসাইটি'-র উদ্বোধন করা হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও সেবার জন্য নির্জনে আধ্যাত্মিক চর্চার জন্য বেলঘরিয়ায় তৈরি হল 'তপোবন'। সাংগঠনিক কাজের সঙ্গী এবং কাজের অঙ্গ হিসেবেই কেশবচন্দ্র নিয়মিত আকর্ষণীয় ভাষণ দান করতেন- যার অমোঘ আকর্ষণ কেউ এড়াতে পারত না। তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ হল ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি কলকাতা টাউন হলে প্রদত্ত 'ভারতের স্বর্গীয় আলোকের অবলোকন' শীর্ষক বার্ষিক ভাষণটি। যার প্রেক্ষিতটি ছিল ব্রাহ্ম উপাসকদের শুদ্ধতা ও আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য কঠোর তপস্যা এবং কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলার ভাষণ। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে শিক্ষা এবং সামাজিক অগ্রগতিতে ব্রাহ্মসমাজ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করেছিল। কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতায় এ সময়ে অনেকেই প্রাণিত হয়েছিলেন। বিশেষত কলকাতার আলোকপ্রাপ্ত নব্য যুবকেরা কেশবচন্দ্রের সুললিত আবেগমথিত ভাষণ শুনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিল। গোরা নিশ্চিভাবেই এই শ্রেণিভূক্ত। গোরাও ছাত্রাবস্থায় কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার সম্মোহনী শক্তি গোরাকে এমন অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ করেছিল যে সে অতিসহজেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। গোরার উপর কেশবচন্দ্র সেনের এই সুগভীর প্রভাবটি একটি মাত্র বাচনেই চিত্রিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ইতিহাস সচেতন রবীন্দ্রনাথ এখানে একজন ঐতিহাসিকের মত উনিশ শতকের আলোকপ্রাপ্ত যুবকদের উপর কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাব আলোচনা করেছেন।

এবার আমাদের আলোচনার বিন্যাসক্রমের দ্বিতীয়পর্বে প্রবেশ করব। গোরার বন্ধু বিনয়কে ঘিরেই গড়ে উঠেছে এই দ্বিতীয়পর্বটি। 'গোরা' উপন্যাসের বিনয়ের কাহিনিতে কেশবচন্দ্র সেনের কথা প্রত্যক্ষভাবে উঠে এসেছে। গোরা যখন হিন্দুধর্ম নিয়ে মেতে উঠেছে; কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে দূরীভূত হয়ে গেছে আবেগ সেই সময়ও কিন্তু বিনয়ের মধ্যে থেকে গেছে কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে আবেগ। কেশবচন্দ্রের চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার অমোঘ আকর্ষণে বিনয় বারবার ছুটে গেছে ব্রাহ্মসমাজে। এই উপন্যাসের দু'জায়গায় বিনয়ের কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে যাওয়ার কথা সরাসরি উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'গোরা' উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিনয়ের কথা কেশবচন্দ্রের প্রসঙ্গটি এসেছে। বিরস দিন, বিরল কাজ, নিঃসঙ্গ চঞ্চল প্রাণ বিনয়ের মন আর ঘরে টিকছে না, সে বেরিয়ে পড়েছে কিন্তু কোথায় যাবে সে বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে নিতে পারেনি, বিনয় প্রথমে ভেবেছে মা আনন্দময়ীর কাছে যাবে কিন্তু তারপরেই সিদ্ধান্ত বদল করে কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শুনে গেছে, উপন্যাসিকের কথায়:

''নিস্তব্ধ ঘরে বড়ো ঘড়িটা টিকটিক করিয়া চলিতে লাগিল; ঘরের মধ্যে বিনয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল। আলোর কাছে দেওয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি পোকা ধরিতেছে— তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বিনয় উঠিয়া পড়িল এবং একটা ছাতা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

কী করিবে সেটা মনের মধ্যে স্পষ্ট ছিল না। বোধহয় আনন্দময়ীর কাছে ফিরিয়া যাইবে এই মতোই তাহার মনের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু কখন এক সময় তাহার মনে উঠিল আজ রবিবার, আজ ব্রাহ্মসভায় কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিতে যাই। একথা যেমন মনে ওঠা অমনি সমস্ত দ্বিধা দূর করিয়া বিনয় জোরে চলিতে আরম্ভ করিল। বক্তৃতা শুনিবার সময় যে বড়ো বেশি নাই তাহা জানিত তবু তাহার সংকল্পে বিচলিত হইল না।'' (পরিচ্ছেদ:৪/পৃ: ১৬)।

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় অমোঘ আকর্ষণ এড়াতে পারেনি বিনয়, সে হাজির হয়েছে ব্রাহ্মসমাজে। উপন্যাসে নবম পরিচ্ছদে বিনয়ের প্রত্যক্ষ বাচনে পেয়ে যাই কেশবচন্দ্র কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শুনিতে যাওয়ার কথা। পরেশবাবুর স্ত্রী বরদাসুন্দরীর কৌতূহল প্রশমনের জবাবে সঙ্কোচে বিনয় জানিয়েছে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে যাওয়ার কথা। এই বক্তৃতা শুনতে যাওয়ার মধ্যে একটা অপরাধবোধও জড়িয়ে আছে বিনয়ের। উপন্যাস চিত্রণটি হয়েছে এই ভাবেই।

''বরদাসুন্দরী কহিলেন, 'মনে হচ্ছে আপনাকে যেন দু-একবার সমাজে দেখেছি।'

বিনয়ের মনে হইল যে তার কী একটা অপরাধ ধরা পড়িল। সে অনাবশ্যক লজ্জা প্রকাশ করিয়া কহিল,

''হ্যাঁ, আমি কেশববাবুর বক্তৃতা ও শুনতে মাঝে মাঝে যাই।'' (পরিচ্ছেদ : ৯/পৃঃ ৩৪)।

হিন্দু-ব্রাহ্মের দ্বন্দ্বরক্তিম সময়ে বিনয় কেশবচন্দ্রের বক্তৃত শুনতে গেছে। নব্য ব্রাহ্ম রক্ষণশীল উদ্ধত ব্রাহ্মদের প্রতিনিধি বরাদাসুন্দরী কেশববাবুর বক্তৃতা শোনার জন্য বিনয়কে যদি বিদ্রুপ করে সে আশঙ্কায় বিনয় সঙ্কুচিতভাবে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে যাওয়ার কথা স্বীকার করেছে। উপন্যাসে কেশববাবু বক্তৃতা শুনতে যাওয়ায় বিনয় যতই সঙ্কুচিত বোধ করুক না কেন এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আলোকপ্রাপ্ত তরুণেরা সকলেই ভিড় করতেন কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শোনার জন্য। উপন্যাসের তরুণ বিনয় কোনো ব্যতিক্রম নয় তাই কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা তাকে ভূতগ্রস্থের মতো টেনে নিয়ে গেছে। সে সময় কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা কিংবদন্তী পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। কেশবচন্দ্র বাংলা এবং ইংরাজি ভাষায় যে আবেগমথিত বক্তৃতা দিতেন তা বহু মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর বক্তৃতা ব্রাহ্মদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তার বক্তৃতার অমোঘ আকর্ষণে অব্রাহ্ম শ্রোতাও জুটে যেত। এই শ্রোতাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন। এছাড়াও নবীনদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, নরেন্দ্রনাথ দত্ত - পরবর্তীকালে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ- এঁরাও নিয়মিত কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শুনতেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার বিষয়, ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গী এঁদের আকৃষ্ট করত। কেশবচন্দ্রের আমলে বাংলার খ্রিস্টিয় যাজকেরা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের যে প্রচেষ্টা চালাত কেশবচন্দ্রের আকর্ষণীয় বক্তৃতা সেই চেষ্টাকে অনেকটাই ব্যর্থ করে দিয়েছিল। বাংলার বহু মানুষ কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন।[৮]

কেশবচন্দ্র প্রসঙ্গে আমাদের এই আলোচনার তৃতীয় পর্যায়ে পরেশবাবুর কথা বলতে গিয়ে এসেছেন কেশবচন্দ্র সেন। 'গোরা' উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদে বিনয় যখন পরেশবাবুর বাড়িতে এসেছে পরেশবাবু তখন তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে বসিয়েছেন বসার ঘরে। সে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে দুটি ছবি: একটি যিশুখ্রিস্টের, অন্যটি কেশবচন্দ্র সেনের। ঔপন্যাসিকের বাচনে দেখে নেব ঘটনাটি:

''বিনয় যে মুহূর্তে ৭৮ নম্বরের দরজার কাছে আসিয়া পৌঁছিল ঠিক সেই সময়েই পরেশও বিপরীত দিক দিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

''আসুন আসুন বিনয়বাবু, বড়ো খুশি হলুম'' এই বলিয়া পরেশ বিনয়কে তাঁহার রাস্তার ধারের বসিবার ঘরটাতে লইয়া গিয়া বসাইলেন।

একটি ছোটো টেবিল, তাহার একধারে পিঠওয়ালা বেঞ্চি, অন্য ধারে একটা কাঠের ও বেতের চৌকি; দেয়ালে এক দিকে যিশুখ্রিস্টের একটি রঙ করা ছবি এবং অন্যদিকে কেশববাবুর ফটোগ্রাফ। টেবিলের উপর দু-চারি দিনের খবর কাগজ ভাঁজ করা, তাহার উপরে সীসার কাগজ - চাপা। কোণে একটি ছোটো আলমারি, বই সারি সারি সাজানো রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। আলমারির মাথার উপর একটি গ্লোব কাপড় দিয়া ঢাকা রহিয়াছে।'' (পরিচ্ছেদ : ৮/পৃ: ২৯)।

পরেশবাবুর বসার ঘরের আনুপুঙ্খিক বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করে নেবো দুটি বাক্যবন্ধ যা আমাদের এই আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী। বাক্যখণ্ড দুটির প্রথমটি হল: 'যিশুখ্রিস্টের একটি রঙ করা ছবি', অন্যটি হল 'কেশববাবুর ফটোগ্রাফ'। এই দুটি বাক্যবন্ধকে আমরা তাৎপর্যবাহী বলছি এই কারণেই যে, পরেশবাবু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ছিলেন এবং কেশবচন্দ্র সেন তখন ছিলেন এই ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার। খাতির চূড়ান্ত শীর্ষে অবস্থান করছেন তিনি। ফলত কেশবচন্দ্রের অনুগামীর ঘরে তাঁর ফটোগ্রাফ থাকাটাই স্বাভাবিক, তাই পরেশবাবুর বসার ঘরে শোভা পাচ্ছিল কেশববাবুর ফটোগ্রাফ।

পরেশবাবুর বসার ঘরে আর একটি ছবির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয় সেটি হল যিশুখ্রিস্টের একটি রঙিন ছবি।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার কেশবচন্দ্র সেনের খ্রিস্টের প্রতি একটি সবিশেষ আবেগ ছিল। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ৫ মে কলকাতার মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে 'Jesus Christ, Europe and Asia' শিরোনামে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন তোলা একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। এই বক্তৃতায় যিশুখ্রিষ্টের প্রতি এক সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছিল। ''খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আসক্তি এই কারণেই গড়ে উঠেছিল যে, যীশুখ্রীষ্ট দীন-দুঃখী-আতুর-পাপী-অস্পৃশ্য সকলের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

'Europe and Asia' বক্তৃতায় (১৮৬৬) যীশু সম্পর্কে পরম শ্রদ্ধাভরে কেশব চন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন : ''He is the finest example of humaneness,...Asia and Europe can learn through him the lesson of unity and hormony.''

অথচ পরিতাপের বিষয়, এই খ্রীষ্টপ্রীতির জন্য তিনি ইতিপূর্বেই অভিযুক্ত হয়েছিলেন দেশবাসীর কাছে। তাঁকে এমন অভিযোগও শুনতে হয়েছিল যে,—তিনি ব্রাহ্মধর্মের আড়ালে আসলে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার করেছেন, বা তাঁর ধর্ম খ্রীষ্টধর্মেরই একটি শাখা মাত্র।''[৯]

এই বক্তৃতার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি কেশবচন্দ্র সেনকে অনেকে খ্রিস্টান বলে ধরে নিয়েছিলেন, দেশি-পন্ডিতরা রুষ্ট হয়েছিলেন, সৃষ্টি হয়েছিল একটি ভুলবোঝাবুঝি। এই ভুলবোঝাবুঝির অবসানের জন্য ১৯৬৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর 'Great Men' নামে কেশবচন্দ্র যে বক্তৃতা করেছিলেন, যেখানে শুধুমাত্র খ্রিস্ট নন সমস্ত মহাপুরুষদের

প্রতিটি তাঁর অনিঃশেষ শ্রদ্ধা ঝরে পড়েছে।

১৮৭০ সালের ২৮ মে লন্ডনে সেন্ট জেমস্ হলে কেশবচন্দ্র সেন যে বক্তৃতা করেন সেখানে তিনি খ্রিস্ট সম্পর্কে তাঁর ধারনাটি স্পষ্ট করেছেন, 'খ্রিস্টকে তিনি জানতে চেয়েছেন নৈতিক সত্যতার দিক থেকে, শুধু তাই নয় আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে; এবং বাইবেল হল সেই আত্মা।'[১০]

খৃষ্ট সম্পর্কে কেশবচন্দ্র বলেন : ''খৃষ্ট বলতে আমি এমন একজনকে বুঝি যিনি বলেন তোমার ইচ্ছাই সব, এবং আমি যখন খৃষ্ট সম্পর্কে বলি তখন আমি ভাবি নিছক ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের আদর্শ।'' ''তোমার ইচ্ছাতেই সব হবে, আমার নয়। যে কোন সময়ে, যে কোন পরিস্থিতিতে একথা বলার জন্য একান্ত প্রস্তুতির আদর্শ।''[১১]

এই বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে খ্রিস্টের পরামর্শ মত তিনি চলেন। সবচেয়ে পবিত্র আর স্নেহময় পিতা দুঃসময়ে আমাদের ত্যাগ করেন না। দীপ্রভাবে কেশবচন্দ্র বলেন, ''আমার হৃদয় এবং অন্তরাত্মার যদি দৈর্ঘ্যপ্রস্থ সব মিলিয়ে খৃষ্টান ধর্মচেতনাকে স্থান দিতে না পারি, তবে যে বিশ্বজননী ঈশ্বরবাদী ধর্মচেতনার শরিক, তাঁর কাছে আমি বিশ্বাসঘাতক হব।''[১২]

যীশুখৃষ্টের যে কল্পনা ছিল সারা বিশ্বের ঐক্য, বক্তৃতায় সেই আশাই - পোষণ করেছেন কেশবচন্দ্র সেন: ''ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা যীশু যা কল্পনা করেছিলেন - ইতস্তত ছড়ানো আড়াইশোধর্ম নয়, একটি সুবিশাল বিশ্বজননী উপাসনাস্থ - যেখানে হাজার হাজার রাষ্ট্রের সহস্র সহস্র কণ্ঠ এক হয়ে মধুর ও উদ্বেলিত ঐকতান ধ্বনিত হবে এবং ঘোষিত হবে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানুষের ভ্রাতৃত্ব।''[১৩]

যেহেতু যিশুখ্রিস্টের প্রতি কেশবচন্দ্র সেনের সবিশেষ দুর্বলতা ছিল সেহেতু কেশবপন্থী ব্রাহ্মদের মধ্যেও তৈরি হয়েছিল যিশুখ্রিষ্টের প্রতি অনিঃশেষ শ্রদ্ধা। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে'র সদস্য পরেশবাবুর উদার মানসিকতাকে চিহ্নিত করার জন্যই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ যিশুখ্রিস্টের রঙিন ছবি বসার ঘরের দেওয়ালে ব্যবহার করেছেন। এটি নিশ্চিতভাবেই ঔপন্যাসিকের সচেতন নির্বাচন।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে কেশবচন্দ্র সেনের উল্লেখ করে সচেতন পাঠককে পৌঁছে দিয়েছেন উপন্যাসের আন্তর্সময়ে। 'গোরা' উপন্যাসে 'কেশববাবুর'র কথা আসায় স্পষ্ট হয়ে গেছে উনিশ শতকের শেষ অর্ধটি - উপন্যাসের 'কেশববাবু' এই শব্দ থেকে পাঠক অনায়াসে পৌঁছে যায় সেই সময়টিতে।

তথ্যসূত

১। লক্ষীনারায়ণ রায় অনূদিত গ্রন্থ : 'ব্রাহ্মধর্মের পরম্পরা ও ইতিবৃত্ত।' দাশগুপ্ত এ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ। পৃ: ৯০

২। History of the Brahmo Samaj. Sivanath Sastri. Sadharan Brahmo Samaj. Calcutta. Second Edition. Reprint. 1993. Page. 115-116.

৩। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। ঝরা বসু। সাহিত্য অকাদেমি। দিল্লী। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ। পৃঃ ২৮

৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী। নিউএজ পাবলিশার্স। কলকাতা। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ। পৃঃ ২৪৭-২৪৮

৫। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। ঝরা বসু। সাহিত্য অকাদেমি। দিল্লী। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ। পৃঃ ৪৫-৮৬

৬। 'নব সংহিতা'। দ্রষ্টব্য গ্রন্থ ঃ কেশবচন্দ্র সেন। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। তথ্য ও বেতারমন্ত্রক, ভারত সকরা। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ। পৃঃ ৩০

৭। দ্রষ্টব্য : ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। ঝরা বসু। সাহিত্য আকাদেমী। নতুন দিল্লী। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ। পৃঃ ২৩-২৪

৮। দ্রষ্টব্য ঃ কেশবচন্দ্র সেন। গৌরী মিত্র। গ্রন্থতীর্থ। কলকাতা। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ। পৃঃ ৩১-৩২

৯। নবজাগরণ ধর্ম - আন্দোলন ও কেশবচন্দ্রের মানবকল্যাণ - সাধনা। ড. দিলীপকুমার দত্ত। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ। পৃঃ ৩৭

১০। কেশবচন্দ্র সেন। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতারমন্ত্রক, ভারত সরকার। নিউ দিল্লী। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ। পৃঃ ৩৯

১১। ঐ। পৃ: ৩৯

১২। ঐ। পৃ: ৪০

১৩। ঐ। পৃ: ল৪১